নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৬, পৃ : ১৯- ৩৫
©২০০১ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় 'ব্যক্তিসত্তা' ঃ উপস্থিতি ও ভূমিকার প্রশ্ন

অবন্তী হারুন*

০.০ ভূমিকা

এই প্রবন্ধে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় 'ব্যক্তি' অর্থাৎ গবেষক ও গবেষিতের আত্মগত (Subjective) উপস্থিতি ও ভূমিকা বিশ্লেষণ করার চেষ্ট করা হয়েছে। নৃবিজ্ঞানের আক্ষরিক অর্থ-মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান। জ্ঞানের স্বরূপটি অনেকাংশে নির্ভর করে জ্ঞানার্জন ও আত্মস্থীকরণের পদ্ধতির উপর। গবেষণা হল জ্ঞানার্জনের বিশেষ পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া। মানুষ সম্পর্কিত জ্ঞান-যা মানুষই অর্জন ও আত্মস্থ করছে তার চরিত্র ও প্রক্রিয়ায় 'ব্যক্তি' মানুষের আত্মগত উপস্থিতি ও বৈশিষ্ট্য অনিবার্য। নৃবিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যক্তির উপস্থিতি কিভাবে গৃহীত ও বিশ্লেষিত হওয়া উচিত তা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে তাত্ত্বিক বির্তকের সূচনা হয়েছে। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ধারা যা গবেষণা পদ্ধতির দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছে তা পর্যালোচনা করা হবে।

নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে গবেষণা, বিশেষতঃ মাঠ গবেষণা নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উৎস প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকলেও গবেষণার পদ্ধতি ও ধরন প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্ন অনুচ্চারিত হয়ে থেকেছে দীর্ঘকাল। কেউ কেউ একে বলেছে 'নৈঃশব্দ্যের ষড়যন্ত্র,' (Conspiracy of Silence) (Berreman 1962) সাম্প্রতিক সময়ে গবেষণা পদ্ধতি, মাঠ গবেষণা, মাঠগবেষণার উপস্থাপনা (Representation), গবেষকের ভূমিকা, প্রথাগত গবেষণালব্দ্ধ জ্ঞানের যথার্থতা, মাঠ গবেষণার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো নানান তাত্ত্বিক পরিসরে পর্যালোচিত হচ্ছে। বস্তুতঃ নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রকৃতি নির্ধারন ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে তা জরুরী ও বটে।

এই প্রবন্ধে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিশেষতঃ মাঠকর্মে গবেষকের ব্যক্তিগত ভূমিকা পর্যালোচনা করা হবে। প্রবন্ধটি তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশে

---

* শিক্ষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

দর্শনের বিভিন্ন ধারা, দ্বিতীয় অংশে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত এবং তৃতীয় পর্যায়ে গবেষণায় ব্যক্তির উপস্থিতি ও ভূমিকা পর্যালোচনা করা হবে।

১.০. বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি ও দার্শনিক প্রেক্ষিত সমূহ

এই অংশে সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান অন্বেষনের পদ্ধতির দিক নির্দেশনা রয়েছে এমন দার্শনিক ধারাগুলো আলোচনা করা হয়েছে। মূলতঃ এই দর্শনগুলোই নৃবিজ্ঞানে বিভিন্ন তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে রেখেছিল প্রভাবক ভূমিকা। ভাবা হয়ে থাকে যে, মানুষ ও মানুষের জীবন সম্পর্কে মৌলিক ও সুসংহত চিন্তা ধারার সূচনা এনলাইটেনমেন্ট যুগে। কিন্তু নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব ও ধারার উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান দর্শনের পাশাপাশি মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার সাথে নৃবিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য সংযোগ পাওয়া সম্ভব।

যে মৌলিক জিজ্ঞাসাগুলোকে নিয়ে পরবর্তীতে মানব সম্পর্কিত জ্ঞান বিকশিত ও বিস্তৃত হয়েছে সেগুলো প্রাচীন গ্রীক ও রোমান যুগেও অনুচ্চারিত ছিল না। বলাবাহুল্য জিজ্ঞাসার জবাব অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সে যুগের ভাষা, দৃষ্টিভঙ্গী ও গুরুত্বের জায়গা বর্তমান হতে ভিন্ন, এমনকি বর্তমান প্রেক্ষিতে কখনও কখনও অসঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু কোনভাবেই নৃবিজ্ঞানের সাথে প্রাচীন দার্শনিক ভাবনাগুলোর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে এড়ানো যায় না। মানুষ ও মহাজগতের (Universe) এর সাথে মানুষের সম্পর্কের স্বরূপ গ্রীক ও রোমান দর্শনের প্রধানতম আলোচিত বিষয়। গ্রীক দর্শনের প্রথম যুগের দার্শনিক (যেমন থেলস, অ্যানাক্সিম্যান্ডার) ব্যাখায় মানুষের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে।

পরবতীতে সোফিস্টরা (Sophist) (যেমন প্রোটাগোরাস্ জর্জিয়াস) জাগতিক বিষয়াদি ব্যাখ্যা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সত্তার সাপেক্ষতাকে আলোচনায় আনেন। অন্যান্যদের মধ্যে সক্রেটিস ও প্লেটো নৈতিকতার আলোকে, অ্যারিস্টোটল জৈবিকতার নিরিখেএবং স্টোয়িক (Stoic) রা নৈতিকতা ও স্বাতন্ত্রবাদের আলোকে মানুষকে ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তুতঃ গ্রীক দর্শনে সমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কযুক্ত। মানুষের জৈবিক গঠন ও প্রক্রিয়া, ভাষা, রাজনীতি, শিল্পকলা- এই সব বিষয়গুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে মানুষ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যেতে পারে। বিশেষতঃ সামাজিক বিজ্ঞানের অনেকগুলো পূর্বশর্ত যেমন-পূর্বানুমান, সহজাত জ্ঞান (Common sense), বস্তুনিরপেক্ষতা, প্রত্যক্ষনবাদ, কৌতূহল, ভাববাদ, বস্তুবাদ, যৌক্তিকতা; সর্বোপরি মানুষের অতীত ও বর্তমান এবং জৈবিক ও সামাজিক অবস্থা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান দর্শনে গভীর গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

রোমান যুগের শেষ দিকে মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে ধারণার ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। খ্রীষ্টবাদের বিকাশের ফলে ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে মানুষ ও সমাজের ধারণায়নেও পরিবর্তন আসে। মধ্যযুগকে মনে করা হয় যে-জ্ঞানের জগতে বিশেষতঃ দর্শনের জগতের একধরনের স্থবিরতার কাল। কিন্তু এসময়েও ইউরোপে বিভিন্ন বীরোচিত কবিতা রচিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন গথিক শিল্প ও স্থাপত্যের পাশাপাশি যুক্তিবিদ্যা ও গণিত শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। সবচাইতে বড় বিষয়, পরবর্তী যুগের জ্ঞানচর্চার মৌলিক ভিত্তি হিসিবে পরিমার্জিত বা বর্ধিত হয়েছে এমন অনেক ধারণা ও তত্ত্বের সূত্রপাত এসময়েই। নূতন নূতন ভৌগলিক এলাকার আবিষ্কারের ফলে ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মোড় হলো-ইতিহাসের চক্রাকার ধারার পরিবর্তে রৈখিক ধারা এবং নির্দিষ্টতার পরিবর্তে সর্বজনীনতায় গুরুত্বের স্থানান্তর (Malefijt 1974:34)। টমাস অগাস্টিনের মানুষ ও জ্ঞান সম্পর্কিত ভাবনায় সামাজিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্থহীন। মানুষ সর্ম্পকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হতাশাব্যঞ্জক। অন্যদিকে টমাস একিনাসের দৃষ্টিতে মানুষ যুক্তিশীল ও স্বর্গীয় গুণাবলী অর্জনে সক্ষম। মানুষের সামাজিক ও নৈতিক বিষয় সম্পর্কে তাঁর ভাবনায় ধর্মীয় ভাবধারা গুরুত্ব পেলেও অনেক ক্ষেত্রে তা মৌলিক চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে।

পরবর্তীতে মানুষ ও সংস্কৃতির ভাবনা ক্রমশঃ বস্তুনিরপেক্ষতা ও প্রত্যক্ষনের দিকে সরে আসে। রজার বেকনের মতে অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষণই নির্ভরযোগ্য সত্য তথা জ্ঞানে উপনীত হবার উপায় বলে চিহ্নিত হয় (Malefijt 1974)।

মানুষ ও সমাজ নিয়ে ভাবনাগুলো বিশেষ রূপ লাভ করে যখন থেকে বিজ্ঞানের ধারণা দর্শনের মূলধারা থেকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। সপ্তদশ শতকের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির সময়কালে বিজ্ঞানের ধারণা দর্শনের মূল ধারা হতে পৃথকভাবে চিহ্নিত হতে শুরু করে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলো মানুষের সামাজিক জীবন বিশ্লেষণ ও অধ্যয়নে একইভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব-এ ধরণের ভাবনা এ সময় হতে ভিত্তি পেতে থাকে। অবশ্য মানুষ ও মানুষের জীবন সংক্রান্ত বিভিন্ন মৌলিক বিষয় যা কিনা এ যাবত শুধুমাত্র ধর্মতত্ত্ব, দর্শন বা মানবিক বিদ্যা (humanities)-র চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে-তাতে এই নতুন বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ খুব সাদরে ও গৃহীত হয়নি। উনিশ শতকের মধ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে চরম অগ্রগতি এবং এনলাইটেনমেন্ট যুগের তত্ত্বের প্রতিক্রিয়ার বিপরীতে রোমান্টিক ধারার বিকাশের ফলে সমাজবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এক ধরণের সংকটে উপনীত হয়।

উনিশ শতক পর্যন্ত সমাজ সম্পর্কিত ভাবনাগুলো ছিল মুলতঃ প্রাকৃতিক আইন নির্ভর। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ধারা ও পদ্ধতি সামাজিক বিজ্ঞানের ধারাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিলো। "বিজ্ঞানই হচ্ছে জ্ঞানের একমাত্র উৎস"–এমন ধারণা এনলাইটেনমেন্ট যুগের বিভিন্ন দার্শনিক ভাবনার মৌলিক প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। বিশেষতঃ বস্তুবাদ ও দৃষ্টবাদে বিজ্ঞানের ধারণা শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছিল।

বস্তুবাদ (Materialism) একটি দার্শনিক মতবাদ হলেও অনেক গুলো ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বস্তুবাদীদের মতে জগৎ বস্তু দ্বারা নির্মিত। বিশ্বের সবকিছুইএমনকি মানুষের আচরণ ও চেতনাও বস্তুর নীতি মেনে চলে। বিজ্ঞানই হচ্ছে জ্ঞানের প্রকৃত রূপ এবং তা সব কিছুর ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। ফ্রান্সিস বেকন মনে করেন বস্তুগত ও মনুষ্যজগতের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রত্যক্ষণ ও পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে উদঘাটন করা সম্ভব। হব্‌স্ সমস্ত পরিবর্তনকে গতি আখ্যায়িত করে বলেন- প্রকৃতি, মানবমন ও সমাজের গতি ও ফলাফল অনুধাবন করাই জ্যামিতি, বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের লক্ষ্য। লকও একই ভাবেই অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেন। কেননা সব ধারণা ও জ্ঞানই অভিজ্ঞতালব্ধ (Hammersley 1989)।

দৃষ্টবাদ (Positivism) এর দর্শনেও বৈজ্ঞানিক সূত্র (Law) গুরুত্বপূর্ণ। দৃষ্টবাদের তিনটি মূল উপাদান রয়েছে। প্রথমতঃ সামাজিক জগত সম্পর্কে অধ্যয়নের প্রধান উদ্দেশ্য কতগুলো সর্বজনীন সূত্র (Universal Law) উদ্ঘাটন যার দ্বারা মানুষের আচরণের কতগুলো নৈমিত্তিকতা (Regularities) চিহ্নিত করা যাবে। দ্বিতীয়ত ঃ জ্ঞান অভিজ্ঞতা বা দৃশ্যমানতার সাথে সম্পর্কিত। শুধুমাত্র ঐ প্রপঞ্চ গুলো সম্পর্কেই আমরা জ্ঞাত হতে পারি যা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। দৃষ্টবাদ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার পরিধির বাইরের জগতকে অস্বীকার না াকরলেও বিষয়টিকে জ্ঞান ও জ্ঞাতব্যের সীমানার বাইরেই রাখে। তৃতীয়তঃ মানবিক জ্ঞানের সর্বাপেক্ষা যৌক্তিক রূপ হলো বিজ্ঞান।

দৃষ্টবাদী ও বস্তুবাদী দার্শনিক ধারায় অনুপ্রাণিত নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাতে পদ্ধতি হিসেবে প্রত্যক্ষণ গুরুত্ব পেয়েছে। এতে উদ্দেশ্য ছিল মূলত মানব সমাজের সর্বজনীন সূত্র নির্ধারণ। অন্যদিকে রোমান্টিকতার ও ইতিহাসবাদী প্রভাবগুলোও ছিল বহুমুখী। সংস্কৃতি বিশ্লেষনে আপেক্ষিকতা, সংস্কৃতির ইতিহাসের নির্দিষ্টতা ছাড়াও রূপায়ন বা ব্যাখ্যা (interpretation)ও সমাজ আলোচনায় অপরিহার্য। তবে রোমান্টিক ও ইতিহাসবাদীরা বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠতা থেকে সরে আসলেও সংস্কৃতি রূপায়নের ক্ষেত্রে আত্মগত উপস্থিতিকে এড়িয়ে গেছেন।

উপরোক্ত দার্শনিক ধারা সমূহ বিজ্ঞান বলতে বিশেষ ধরনের জ্ঞানের পরিবর্তে বরং জ্ঞানের অন্বেষন বা অনুসন্ধানের বিশেষ ধরনের পন্থাকে নির্দেশ করে। সুতরা বিজ্ঞান হচ্ছে প্রপঞ্চসমূহ (Phenomena) বিশ্লেষণের বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিনির্ভর ও পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া, যা নির্ভরযোগ্য জ্ঞান আহরণে সক্ষম (Lastrucci 1963:6, quoted in Pelto and Pelto 1993) অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের বস্তুবাদের প্রতিক্রিয়ার চরম ভাববাদী ধারা বিকশিত হয়। চরম ভাববাদীরা একদিকে জার্মান রোমান্টিক ধারার আধ্যাত্মিকতা (Spirtuality) ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য (বস্তুবাদের সর্বজনীনতার বিপরীতে) এবং অন্যদিকে কান্ট এর সংস্কারমূলক ধারার মানবিক আকাঙ্খার স্বাধীনতা এই দুয়ের মাঝে সমন্বয়ের প্রয়াস নেন। রোমান্টিকরা মানবতার সর্বজনীন একটি রূপের পরিবর্তে মানবতাকে অভিব্যক্তিপূর্ণ সমগ্রতার মধ্যে দেখতে আগ্রহী। সমগ্রতার অন্তর্গত প্রতিটি অংশের সাথে অন্য অংশের সম্পৃক্ততা বিশ্লেষণের দ্বারা অনুধাবন করা সম্ভব। তাঁরা এনলাইটেনমেন্টের স্বাতন্ত্রবাদের বিপক্ষে অবস্থান নেন। কেননা তাঁদের মতে, মানুষ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রবাহিত ও বিকশিত বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বাস করে, এবং এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাদের জীবনযাপনের নিজস্ব ধরন আছে এবং যে ধরনটি নিজ যোগ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ (Hammersly 1989:13) নব্য-কান্টবাদীরা অবশ্য দৃষ্টবাদী ও বস্তুবাদী ধারার প্রাকৃতিক ধারার প্রাকৃতিক জ্ঞান নির্ভরতাকে প্রত্যাখান করেছেন। তবে তাঁরা সমাজ জীবন চরিত্রগতভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে ভিন্ন এরূপ ইতিহাসবাদী সরলীকরণের বিপক্ষে। বরং তাঁদের (যেমনঃডিলথে) মতে নিরীক্ষণকারী তার মূল্যবোধের সাপেক্ষে বিভিন্নভাবে অভিজ্ঞতাকে রূপায়িত করে। এদিক থেকে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের পদ্ধতি ভিন্ন কেননা তাদের বিষয়ও ভিন্ন। তাই বিজ্ঞান ও ইতিহাস পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বাস্তবতাকে তুলে ধরে। সুতরাং বলা যায় দৃষ্টবাদী, বস্তবাদী ও রোমান্টিকদের তুলনায় নব্য কান্টবাদীরা বরং সংস্কৃতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির উপস্থিতিকে তুলে ধরেছেন।

রোমান্টিকরা "আদর্শ" নির্ধারণে সাংস্কৃতিক চলককে গুরুত্ব দিলেও কান্টের মতে সম্পূর্ণভাবে কার্যকারনের অধীন হওয়া প্রয়োজন। হেগেল অবশ্য এই দুয়ের মাঝে সংযোগ করেছেন এভাবে যে, কার্যকারন (Reason) কোন স্থির বিষয় নয় এবং তা সময়ের প্রেক্ষিতে বিকাশমান ও জগতের মধ্যে পরিব্যপ্ত।

রোমান্টিকদের মতো ইতিহাসবাদী (Historicist) রাও মানবচরিত্রের একক প্রকৃতি (Uniformity) নির্ধারনের বিপক্ষে। এনলাইটেনমেন্ট যুগের বিভিন্ন দার্শনিক ঐতিহ্য ও স্থানীয় প্রথাকে প্রগতির প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখেছেন। কিন্তু

ইতিহাসবাদীদের কাছে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা শুধু বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস ও চর্চার ওপরই জোর দেন তা নয়, বরং তাদের মতে এই বিচিত্রমূখী বিশ্বাস ও চর্চাকে নিজ নিজ প্রেক্ষিতের আলোকে ব্যাখ্যা (Interpret) ও মূল্যায়ন করা জরুরী। তাই কোন কোন ইতিহাসবাদী (যেমন ডিলথে)র মতে, জীবন অভিজ্ঞতাকেও সামাজিক সাংস্কৃতিক জগতের মত অনুধাবন করতে হবে, কোন স্বতন্ত্র বা ব্যক্তি প্রপঞ্চ হিসাবে নয়। ইতিহাস বাদী ধারায় গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ হচ্ছে *Verstehen* । *Verstehen* আক্ষরিক অর্থ অনুধাবন। ম্যাক্সভেবার, ডিলথে প্রমুখ মনে করেন বিষয়বস্তুর কারণে মানবিক বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হতে গুনগত মাত্রায় ভিন্ন। তাই এর অনুধাবন প্রক্রিয়া ভিন্ন। Ranke বলেন-*Vestehenr হচ্ছে মানুষের আত্মোপলব্ধি ঃ নিজস্ব বৈচিত্রের মধ্যে দিয়ে মানবতার আত্মঅনুধাবন* (Ranke, quoted in Hammersley 1989:25)।

অর্থনীতি, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, আইন কিংবা মানুষ ও মানুষের জীবন সংক্রান্ত অন্যান্য সামাজিক জ্ঞানকান্ডের জ্ঞান পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করে ভেবারের অবস্থান দৃষ্টিবাদের বিপক্ষে। তাঁর প্রধান আলোচ্য উক্ত সামাজিক জ্ঞানকান্ডগুলোর 'যুক্তিশীল' (Logical) চরিত্র এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতির সমালোচনা। সমাজবিজ্ঞানে এমন কতগুলো সামজিক প্রপঞ্চ গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়, যা অন্য আরেকটি সামাজিক প্রপঞ্চ হতে ভিন্ন এবং একটি নির্দিষ্ট প্রপঞ্চের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য আলোচিত ও বিশ্লোষিত হয়। অন্যদিকে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে, ঘটনা বা বস্তুকে তার বহুমুখীন চরিত্রে নিরিখে শ্রেণীকরণ করা হয়। আবার ধরা যাক, কোন একটি সামাজিক প্রপঞ্চের বহুমুখী চরিত্র ও মাত্রা রয়েছে-সেগুলোকে একটি নির্দিষ্ট পন্থায় বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই বিশ্লেষণ পন্থাকে ভেবার বলেছেন মূল্যবোধ-সাপেক্ষতা (Value Relevance)। তাঁর মতে, এই মূল্যবোধ একই সংস্কৃতির সদস্যদের প্রভাবিত করে ও এ ধরনের মূল্যবোধ বিশেষ বিশেষ ঘটনা (fact) বা বিষয়কে এক ধরণের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য দেয়। সুতরাং গবেষণার বিষয় নির্ধারণে সামাজিক 'মূল্যবোধের' অর্থাৎ গবেষকদের ক্ষেত্রে মূল্যবোধের প্রভাব অনুধাবন করা জরুরী। তার অর্থ এই নয় যে, কোন একটি নির্দিষ্ট সামাজিক বিষয়ে একেকজনের দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। বরং এই ধরণের মূল্যবোধের কি তাৎপর্য রয়েছে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সেই অর্থে ভেবার, ব্যাখ্যা (Interpretation) ও অনুধাবন প্রক্রিয়াকে গুরুত্বপূর্ন মনে করছেন।

Schulz অবশ্য ভেবার এর প্রস্তাবনাকে গ্রহণ করেছেন। তিনি ভেবারের আত্মগত ব্যাখ্যা (Subjective Interpretation) এর ধারণাকে আরও বিশদভাবে স্পষ্ট

করেছেন। কোন কর্ম কান্ডের কর্তার কাছে অর্থবহতা, তাই হচ্ছে আত্মগত অর্থ। এটি গবেষকের অনুধাবন করা প্রয়োজন। অন্যদিকে গবেষকের কাছে উক্ত কর্মকান্ডের যে অর্থ তা হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ অর্থ। অর্থাৎ গবেষক ও গবেষিত উভয়ের অর্থবহতাই গবষণার জন্যে অপরিহার্য। অনেক ক্ষেত্রে আত্মগত অর্থ গবেষকের অর্থের চাইতে সম্পুর্ণ ভিন্ন হতে পারে। তবে তা গবেষক ও গবেষিত উভয়ের প্রত্যাশা ও পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চেতনার সংযোগে অনুধাবন করা সম্ভব। গবেষক যদি সহজাত জ্ঞাত (Common Sense) নির্ভর পরোক্ষ গবেষক হয়, তবে তার চোখে গবেষিতের এক ধরণের কল্পিত মডেল তৈরী হবে।

অর্থবহতা এসেছে হেবারমাসের আলোচনাতেও। তিনি বিজ্ঞানকে তিনভাগে ভাগ করেছেন ঃ প্রত্যক্ষণ-বিশ্লেষণ ধর্মী, ঐতিহাসিক অর্থনির্ভর এবং সমালোচনামূলক। তাঁর মতে প্রত্যক্ষণ-বিশ্লেষণ ধর্মী বিজ্ঞান, বস্তু বা বিষয় কে অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে এক ধরণের নিয়ন্ত্রণ তৈরী করে। ঐতিহাসিক-অর্থবাদী বিজ্ঞান বিষয় বা বস্তুকে অনুধাবনের লক্ষ্যে অধ্যয়ন করে। অর্থসমূহের জটিলতা অনুধাবন করা যায় তবে তা বিশেষ প্রক্রিয়ায়। সমাজের বিভিন্ন বিষয় অনুধাবন করার ক্ষেত্রে একজন সমাজ বিজ্ঞানীর পূর্বানুমিত কিছু ধারণা থাকে। আবার সমাজের আংশিক উপাদানগুলোকে অনুধাবনের পরিপ্রেক্ষিতে তার মধ্যে সামগ্রিকতার ধারণা তৈরী হয়। গবেষকের পূর্বানুমান তার জীবন ও অভিজ্ঞতার আলোকেই তৈরী হয়। এভাবে অর্থ ও অনুধাবনের চক্রাকার প্রক্রিয়া চলমান।

অনেকেই বলে থাকেন, এনলাইটেনমেন্ট যুগের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের বিকাশের দ্বার উন্মোচন করেছিল। এসময়কালের তত্ত্বগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন নৃবিজ্ঞানের অনেক তাত্ত্বিক। যেমন ডুরখাইম মঁতেস্ক্যুর মতবাদ দ্বারা, র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও ইভান্স-প্রিচার্ড স্কটিশ দার্শনিকদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। হার্ডার কর্তৃক ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদের প্রতি গুরুত্বআরোপ এবং Culture শব্দটি আধুনিক অর্থে ব্যবহারের জন্য বোয়াস তাকে আখ্যায়িত করেন সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের জনক বলে। লীচ ভিকোকে নৃবিজ্ঞানের জনক বলতে আগ্রহী। এছাড়া রয়েছেন দেকার্তে, কোঁতে, বোকাচ্চিও প্রমুখ-যাঁদের তত্ত্ব ও দর্শন নৃবিজ্ঞানের তত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু এই অংশে মূলত সেসব দার্শনিক ধারা আলোচনা করা হয়েছে যেগুলোতে জ্ঞান আহরণের পদ্ধতি বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত।

২.০ নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক ধারা

গবেষণা ও গবেষণা পদ্ধতি নানাভাবে নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়ে আসছে। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতির অর্থবহতার তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত ও বাস্তব চর্চার ক্ষেত্র এই অংশে আলোচনা করা হবে।

গবেষণার বিষয়, গবেষক নিজে, গবেষণা প্রকল্পের বিভিন্ন ধরন ও গবেষণার বিভিন্ন পরিস্থিতি সাপেক্ষে গবেষণা পদ্ধতি ও মাঠকর্মে বিভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে দুটো বিষয় সর্বজনীনঃ গবেষকের উপস্থিতি এবং গবেষণাধীন বিভিন্ন মানুষের (জনগোষ্ঠির) সাথে গবেষকের মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ। গবেষকের চারিত্র্য ও মিথস্ক্রিয়ার গুনগত মাত্রার ওপরই তথ্য ও উপাত্ত এবং সমস্ত গবেষণালব্ধ জ্ঞানের চরিত্র নির্ভর করে। নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাস ও বিভিন্ন তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত পর্যালোচনা করে দুটি মূল ধারা চিহ্নিত করা যেতে পারে-একটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক (Scientific) বা বস্তুনিরপেক্ষ (Objective) ধারা এবং অন্যটি হচ্ছে মানবিক (Humanistic) বা ব্যাখ্যামূলক (Interpretation) ধারা (Salzman 1996) কেউ কেউ অবশ্য এই দুটো ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে বলেন–এই দুটো ধারাই হচ্ছে সমসাময়িক নৃবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য (Objective) ও লক্ষ্য (Goal)। এই দুটি ধারা যদি দুটি ভিন্ন মেরু হয় তবে গবেষক নিজেকে এই দুয়ের মধ্যবর্তী কোন একটি অবস্থানে স্থিত করে, নতুবা এক অবস্থান হতে অন্য অবস্থানে স্থানান্তরের নিরন্তর প্রক্রিয়ার নিয়োজিত থাকে (Salzman 1996)। আর অন্যদিকে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও গবেষকের ব্যক্তিগত জবাবদিহিতার ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে বিকশিত হয়েছে প্রতিবর্তী (Reflexive) ধারা। নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব, ইতিহাস ও পদ্ধতি সম্পর্কে এই ধরনের ধারাগত ব্যাপক বিভাজন সব সময় নৃবিজ্ঞানের বহু বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম নয়।

উনিশ শতকেই একটি পরিপূর্ণ জ্ঞান কান্ড হিসেবে নৃবিজ্ঞান আত্মপ্রকাশ করে। মানব অধ্যয়নের ইতিহাস যদিও বহু প্রাচীন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ধাপ থেকেই নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসকে সমীক্ষণ করা শুরু হয়। এ ধরনের সমীক্ষণের দ্বারা নৃবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ পূর্ববর্তী তত্ত্ব ও পদ্ধতিগুলোর ঘাটতি কিংবা ত্রুটি নির্দেশ করেছেন এবং তা থেকে নিজ নিজ তত্ত্ব ও পদ্ধতিকে পূর্ববর্তী ধারা হতে ভিন্ন মাত্রায় চিহ্নিত করেছেন। এ ধরনের প্রবণতা প্রথম বিশেষভাবে দেখা যায় বোয়াস ও তার অনুসারীদের মাঝে, যারা বিবর্তনবাদী তত্ত্ব ও পদ্ধতি হতে নিজেদের অবস্থানকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে দাবী করে।

নৃবিজ্ঞান একটি জ্ঞানকান্ড হিসাবে বিকশিত হবার পর্বে মূলতঃ এথনোগ্রাফি রচনাই ছিলো নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার লক্ষ্য। ১৮৫১ সালে প্রকাশিত মরগানের The League of Ho-de-no-sau-nee or Iroquois কে প্রথম এথনোগ্রাফি বিবেচনা করা হয়। এর প্রধান দুটি উদ্দেশ্য ছিলঃ একদিকে ইরোকুয়া সমাজের কাঠামো ও প্রক্রিয়া দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে চিত্রায়িত করা, এবং অন্য দিকে এই এথনোগ্রাফিক গুলোকে সে সময়কাঁর একক উৎপত্তিবাদী (Monogenist) তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে উপস্থাপন। পরবর্তীতেও তিনি এথনোগ্রাফিক তথ্যের উপর বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি নিজে আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের কাছ তথ্য সংগ্রহ করলেও তার বেশীর ভাগ তথ্য ও উপাত্ত ছিল সেকেন্ডারী উৎস নির্ভর। সমসাময়িক অন্যান্য নৃবিজ্ঞানিকদের ক্ষেত্রেও একথা খাটে। বোয়াস এই প্রবণতাকে আখ্যায়িত করেছেন Armchair anthropology বলে। তিনি নিজে পর্যাপ্ত মাঠ ভ্রমন করলেও তার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিতে খুব একটা ভিন্ন বলা যাবে না। কেননা তার সামনে উপবিষ্ট তথ্য দাতাদের দ্বারা উচ্চারিত বিভিন্ন টেক্সটের রূপান্তর (Transcription) ই হলো তাঁর তথ্য সংগ্রহের মূল উৎস।

১৯২০ ও ১৯৩০ এর দশকে বৃটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানীদের প্রথম প্রজন্ম আমেরিকান ধারার ইতিহাসবাদীতাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছেন। এমনকি বৃটিশ ধারা ঐতিহ্যকেও। তবে তাঁদের তত্ত্ব ও আলোচনাগুলোও নিঃসন্দেহে নির্দিষ্ট ইতিহাস ও প্রেক্ষিতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ বিষয়ে কুপ্যার (Kuper 1988) বিশদ আলোচনায় দেখিয়েছেন বৃটিশ ধারার সামাজিক নৃবিজ্ঞানে বর্তমানবাদ (Presentism) ও ইতিহাসবাদের আন্তঃসম্পর্ক।

নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিলেন মালিনস্কী তার ট্রবিয়ান্ড দ্বীপে মাঠকর্মের দ্বারা। গবেষিত স্থানীয় জনগোষ্ঠির ভাষা শেখার পাশাপাশি দীর্ঘ সময় ধরে তাদের মাঝে বসবাস করে তাদের জীবনযাত্রাকে উপলব্ধি করার দ্বারা যে গবেষণা পদ্ধতির সূচনা করেন তা দীর্ঘকাল ধরে নৃবিজ্ঞানে সমাদৃত হয়ে আসছে। অংশগ্রহণকারী নিরীক্ষণ পদ্ধতিতে গবেষনা এবং ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের আলোকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণ নৃবিজ্ঞানে অন্যতম শক্তিশালী ধারা। অংশগ্রহণকারী নিরীক্ষণ পদ্ধতির তাত্ত্বিক ভিত্তি হচ্ছে ক্রিয়াবাদ ও কাঠামোগত ক্রিয়াবাদ।

ক্রিয়াবাদ ও কাঠামোগত ক্রিয়াবাদের ধারণায়নে ডুরখাইম ও দৃষ্টবাদী ধারার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। যে কারণে উভয় তত্ত্বে দৃশ্যমানতা ও প্রত্যক্ষণ সমাজ বিশ্লেষনে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। বস্তুর বা জীবের বস্তুগত অবস্থার মত করে নৃবিজ্ঞানের অধীত বিষয় সমূহের অস্তিত্ব অনুধাবন, যৌক্তিকতার পরিধিতে

বাস্তবতা বিশ্লেষণ-নৃবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাড়িয়েছিল মূলতঃ আদর্শ 'বিজ্ঞান' হয়ে ওঠার তাগিদ থেকে। বলাবাহুল্য, আদর্শ 'বিজ্ঞান' এর ধারনা দৃষ্টবাদী ও বস্তুবাদী ধারার সাথে সম্পর্কিত। একদিকে সমাজ ও সামাজিক জীবন বস্তুর অস্তিত্বের মতই বাস্তব; এবং অন্য দিকে তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যেমনঃ- মাঠ গবেষণা, বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা ও প্রতক্ষণের দ্বারা জ্ঞাত হওয়াও সম্ভব। মনে করা হতো, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত নৃবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো এমন কতগুলো সাধারণীকরণে উপনীত হওয়া যা সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রপঞ্চের সাদৃশ্য ও বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। সুতরাং নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে সমাজ ও সংস্কৃতিক কতগুলো সূত্র উদঘাটন করা যাবে যা দ্বারা এর কার্যকারণকেও ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

এই পরিস্থিতির নিরিখে অংশগ্রহণকারী নিরীক্ষণ ও প্রত্যক্ষণ নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার জনপ্রিয় গবেষনা পদ্ধতি হয়ে উঠেছিল। মালিনোস্কীয় পদ্ধতিতে মাঠ গবেষণা শুধুমাত্র ইউরোপেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং আটলান্টিকের উভয় তীরে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা, বিশেষতঃ এথনোগ্রাফি রচনায় তা হয়ে ওঠে অপরিহার্য। দৃষ্টবাদের তাত্ত্বিক ঘরানা যেমন বৈজ্ঞানিক গবেষনা পদ্ধতি বিকাশকে প্রভাবিত করে তেমনি *Verstehen* এর ধারণাও ব্যাখ্যামুলক (Interpretive) ধারাতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসাবে কাজ করেছে। ব্যাখ্যামূলক ধারা অনুসারে, নৃবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য মানুষের সামাজিক জীবন ও সংস্কৃতিকে অনুধাবন করা। এই অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন গবেষিতদের প্রতি সহমর্মীতা (empathy) ও আত্মস্থীকরণ দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে সংস্কৃতির সদস্যদের কাছে তাদের সংস্কৃতির যে অর্থবোধকতা তাদের জীবনকে রূপায়িত করছে, তা বর্ণনা অনুধাবন করাটা জরুরী হয়ে পরে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সমস্ত Facts বা গবেষণার বস্তু মূলতঃ কোন না কোন Interpretaion বা ব্যাখার ফসল। সামাজিক জগৎ বস্তুজগতের মত একই ভাবে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রতক্ষণযোগ্য গবেষণার জগৎ নয়, বরং তার সাথে প্রতিনিয়ত অর্থবোধকতার সংযোগ হচ্ছে। নৃবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন গবেষণা বা বর্ণনা থেকে মূলতঃ এই অর্থবোধকতাকে উদঘাটন করা প্রয়োজন। একটি বিষয়ে একাধিক অনুবাদ থাকা সম্ভব-গবেষক ও গবেষিতদের বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গির যে বিভিন্ন সম্ভাব্য অনুবাদ সমূহ রয়েছে, নৃবৈজ্ঞানিক বর্ণনায়, তার কোন একটি পরিস্ফুট হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নৃবিজ্ঞান ইতিহাস কিংবা সাহিত্যের সমগোত্রীয়। ক্লিফোর্ড গীয়ার্জ ধারার প্রধান প্রবক্তা। তার পাশাপাশি বোয়াস ও ভেবারকেও এই ধারার অর্ন্তগত করা হয় (Salzman 1996)। তবে এর সাথে পুরোপুরি একমত হওয়াটা কঠিন। কাজের বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতার কারণে বোয়াসকে কোন নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ঘরানায় ফেলা দুঃসাধ্য। দীর্ঘ তিন হাজার মাইলের এলাকায় পরিভ্রমণ, স্থানীয়দের মাঝে অবস্থান, স্থানীয় ভাষা ও আচরণ শেখা, তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, স্থানীয় আচার ও

অনুষ্ঠানাদি পর্যবেক্ষণ এর দ্বারা নৃবিজ্ঞান, বিশেষত এথনোগ্রাফিকে বিজ্ঞানধর্মী করে তোলাই ছিল বোয়াসের প্রয়াস।মজার ব্যাপার হচ্ছে, পদ্ধতিগত ভাবে তিনি 'বৈজ্ঞানিক' হতে চেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বিশ্লেষণ-এর ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বের জায়গায় ছিল সম্পূর্ন ভিন্ন।এথনোগ্রাফিক বর্ণনার ধাঁচে Kwakiutl জনগোষ্ঠির পৌরাণিক কাহিনীর বিভিন্ন বিষয়, কর্মকান্ড ও বিশ্বাস ইত্যাদি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বোয়াস বলেন ঃ *এর দ্বারা তাদের চিন্তা ও অনুভবের ধরন সম্পর্কে একটি চিত্র পাওয়া যেতে পারে, যা যতদুর সম্ভব একজন ইউরোপীয় পর্যবেক্ষণকারীর পক্ষপাত মুক্ত* (Boas 1935)। ব্যাখ্যামূলক ধারার ক্ষেত্রে সহমর্মীতা প্রধান গুরুত্ব পায়, বস্তুনিষ্ঠতা নয়। সহমর্মীতা অর্জন করা সম্ভব স্থানীয় কর্মকান্ডে অংশ গ্রহনের মাধ্যমে বা স্থানীয়দের সাথে মিথস্ক্রিয়া যেমন আলাপ আলোচনা, সাক্ষাতকার ইত্যাদির দ্বারা। পাশাপাশি স্থানীয় সংস্কৃতির সামষ্টিক অভিব্যক্তি যেমন -প্রবাদ, গান, গল্প, আচার অনুষ্ঠান, পৌরনিক কাহিনী ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। উপরোক্ত বিষয়গুলো সমন্বয় ও বিশ্লেষণ হতে স্থানীয় অধিবাসীদের অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি, উপলব্ধি ও অর্থবোধকতাকে অনুভব করা যেতে পারে।

পরবর্তীকালে স্থানীয় সংস্কৃতির অর্থবহতা অনুভবই শুধু নয় গবেষক ও গবেষিতের মধ্যকার সামাজিক, রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের প্রতিবর্তী (Reflexive) চরিত্র অনুধাবন করাটাও গবেষণার উপজীব্য হয়ে দাড়ায় (Rabinow 1977) ষাটের দশকে বৃটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানের দ্বিতীয় প্রজন্মের আলোচনায় আবার উঠে আসে নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস। দীর্ঘকাল ধরে 'বিজ্ঞান' হয়ে ওঠার তাগিদ বা 'জ্ঞান' আহরণের জন্যই শুধুমাত্র 'জ্ঞান' এই ধরনের ভাবনা নৃবিজ্ঞানের গবেষণাকে চালিত করেছেন। জ্ঞানের তাগিদে যে 'বস্তু নিরপেক্ষতা' ও 'পক্ষপাতহীনতা' এবং এর দ্বারা 'সর্বজনীন সূত্র' উদঘাটনের প্রয়াস দ্বারা মূলতঃ ক্ষমতা তথা উপনিবেশবাদকে আড়াল করার চেষ্টা --এই বক্তব্যগুলোকে সামনে নিয়ে আসেন প্রতিবর্তী ধারার নৃবিজ্ঞানীরা।

উপনিবেশোত্তর যুগের অন্যতম শক্তিশালী তাত্ত্বিক ধারা উত্তর-আধুনিকতাবাদ ইতিহাস সাহিত্যে বা অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান, ভাষা ও পদ্ধতিকেও পূনর্মূল্যায়নের প্রশ্ন তোলে। এক্ষেত্রে সংস্কৃতির লিখন এবং প্রেক্ষিতেরধারণা নৃবিজ্ঞানের নতুন কতগুলো গতিপথের নির্দেশনা দিয়েছে। নৃবিজ্ঞানের উত্তরাধুনিকতাবাদী ধারণায় অন্যতম ভাবনা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক এথনোগ্রাফিক রচনা নয় বরং এথনোগ্রাফিক টেক্সটগুলো ও টেক্সট রচনার প্রক্রিয়া। উত্তরাধুনিকতাবাদ প্রভাবিত ধারায় জ্ঞানকান্ডের আধিপত্যশীল ভাবনাগুলোকে প্রশ্ন করা ও পূর্ণমূল্যায়ন করাই শুধু নয়, গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে বৃহৎ বয়ান (Metanarrative) ও

তত্ত্বগুলোর অবনমন, এবং প্রেক্ষিতায়ন ও আত্মবাচকতা (reflexivity)। মাঠকর্ম নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানের ভিত্তি বলে মাঠকর্ম ও গবেষণালবদ্ধ সত্যের যথার্থতাও প্রশ্নসাপেক্ষ। সুতরাং মাঠকর্ম, এথনোগ্রাফিক রচনা ও এথনোগ্রাফিক সত্য – সবই প্রেক্ষিত ও আত্মবাষকতার সাপেক্ষে বিবেচ্য। উত্তর আধুনিকতা তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত বিভিন্ন ধারায় জ্ঞানের, বিশেষত বিজ্ঞানের কর্তৃত্ব প্রত্যাখাত। বরং যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গবেষক, গবেষণার এবং তথ্যায়নের অধিকার পায় সেই প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। মাঠ গবেষণা' ও নৃবিজ্ঞানের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ফলাফল, যেখানে উপনিবেশবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। ৭০ এর দশকের আমূলবাদী (Radical) ও পরবর্তীতে উত্তর-আধুনিকতাবাদ ধারায় প্রভাবিত নৃবিজ্ঞানীদের আলোচনায় নানাভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে নৃবিজ্ঞানের ঔপনিবেশিক অতীত ও জ্ঞানের ঔপনিবেশিকতা (Hymes: 1969)। উপনিবেশবাদ শুধু যে এই জ্ঞানকান্ডকে বিশেষ রূপ দান করেছে তা নয়, বরং মাঠ গবেষণা ও গবেষণার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আগ্রহ তৈরী এবং ক্ষেত্র উন্মোচনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে (Asad 1973)। পাশাপাশি আরো বলা যে নৃবিজ্ঞান নামক জ্ঞানকান্ডটি রূপান্তরণের দ্বারা পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক হেজেমনি তৈরী হয়েছে। এই ধরনের পটভূমিতে রচিত এথনোগ্রাফিতে চিত্রায়িত 'অন্য' বস্তুতঃ পশ্চিমা সংস্কৃতি 'আত্ম' নির্মাণের রাজনীতিরই অংশ। এই প্রক্রিয়াকে কেউ কেউ চিহ্নিত করেছেন টেক্স্চুয়াল উপনিবেশবাদ হিসাবে (Abu-Lughod 1991)।

আশির দশকের মধ্যভাগে মাঠগবেষনাই শুধু নয়, মাঠ গবেষণার উপস্থাপনাও লিপিবদ্ধকরণের মধ্যে দিয়ে জ্ঞানকান্ড ও গবেষকের কর্তৃত্বের বিষয়টিও আলোচনায় স্থান পায়। যে কারণে গবেষণা ও গবেষকের প্রেক্ষিতায়ন (Contextualization) বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অপরির্হায হয়ে দাঁড়ায় (Clifford and Marcus 1986)। গবেষণায় গুরুত্ব পায় বহুস্বর (Multivocality)। প্রথাগত 'বস্তনিষ্ঠতা'র স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখানো হয় কিভাবে বস্তনিষ্ঠতা ও প্রত্যক্ষণের গুরুত্ব ইতিহাস ও রাজনীতির অপরিহার্যতাকে এড়িয়ে গেছে।

নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত ক্রিয়াশীল প্রভাবক হিসাবে কাজ করেছে। তাত্ত্বিক জগতের পরিবর্তনের ধারাগুলো গবেষণা পদ্ধতি, বিষয়বস্তু, গবেষণার উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে।

৩.০ নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি ও ব্যক্তি

দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতা থাকলেও বৈজ্ঞানিক ও ব্যাখ্যামূলক--উভয় ধারাতে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পদ্ধতি হচ্ছে অংশগ্রহণকারী নিরীক্ষণ। এক বা একাধিক

জিজ্ঞাসাকে সামনে রেখে নির্দিষ্ট স্থান বা জনগোষ্ঠি নির্ধারণ; তাদের মাঝে সময় অতিবাহিত করা; আলাপ আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, প্রধান তথ্যদাতা, জীবন ইতিহাস, মৌখিক ইতিহাস, সেকেন্ডারী উৎস পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, নোট নেওয়া, রিপোর্ট তৈরী ইত্যাদি এক বা একাধিক পদ্ধতির সমন্বয়ে পদ্ধতিগত ভাবে জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষণ; প্রাপ্ত তথ্য ও বিরাজমান তত্ত্বের পর্যালোচনা হতে জ্ঞানের পর্যালোচনা, পরিমার্জনা কিংবা সংযোজন--এগুলোকেই গবেষণার বিভিন্ন পর্যায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

বৈজ্ঞানিক গবেষনা পদ্ধতিতে জরিপ; পর্যবেক্ষণ; যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন কাঠামোগত সাক্ষাৎকার, নমুনায়ন ও তুলনামূলক আলোচনার উপরে বেশি জোর দেওয়া হয়। কতগুলো নির্দিষ্ট চলকের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক বা সম্পর্কের পূর্বানুমান যাচাই করা এ ধরণের গবেষণার উদ্দেশ্য। অন্য দিকে ব্যাখ্যামূলক গবেষণাপদ্ধতিতে অনুভব, অনুধাবন ও সঞ্চারিত অভিজ্ঞতার অর্থবহতাকেই গুরুত্ব দেয়া হয়, যা গবেষক ও গবেষিত উভয়ের চেতনার সাথে সংশ্লিষ্ট। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, তথ্যের সর্বোচ্চ মান বজায় রাখা, মানবিক পক্ষপাত ও আত্মগত (Subjective) ভূমিকা হতে উদ্ভূত সম্ভাব্য ত্রুটি দুর করার জন্য তথ্য সংগ্রহের নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, মান নিয়ন্ত্রণ ও যাচাই এবং পূনঃ পুনঃ পরীক্ষনের সাহায্য নেয়া হয়। বিপরীতে বস্তুনিষ্ঠতার পরিবর্তে আন্তঃব্যক্তিক মিথস্ক্রিয়া ব্যাখ্যামূলক গবেষণায় গুরুত্ব পায়।

প্রতিবর্তী ধারায়, তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত ও গবেষণা পদ্ধতির পুর্ণমূল্যায়নতো বটেই, পাশাপাশি গবেষকের সামাজিক দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতাকেও অপরিহার্য মনে করা হয়। মার্ক্সবাদী কিংবা নারীবাদীরা শুধুমাত্র জ্ঞানতাত্ত্বিক তাগিদ নয় বরং গবেষকের সক্রিয় সামাজিক ভূমিকার পক্ষপাতী। যেহেতু সমস্ত নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তত্ত্বের রাজনৈতিক পটভূমি রয়েছে, তাই এমন একটি তাত্ত্বিক কাঠামো ও গবেষণা পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন যা গবেষিত প্রান্তিক এবং নিপীড়িতদের স্বার্থ সংরক্ষনে সহায়ক।

৩.১ গবেষণা পদ্ধতিতে 'ব্যক্তি'র উপস্থিতি

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন মিথস্ক্রিয়া, সহযোগিতা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে গবেষণা অতিক্রান্ত হয়। অতিক্রমনের এই প্রক্রিয়ার উপর গবেষণার গুনগত মাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন হয়। মালিনস্কী অংশগ্রহণকারী নিরীক্ষণ পদ্ধতিতে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে যে বীরোচিত ইমেজ তৈরী করেন; এবং সেটি আবার যখন তাঁর ব্যক্তিগত ডাইরীর বিভিন্ন মন্তব্যে আলোড়িত হয় তখন তাকে শুধু মাত্র কপটতার একমাত্রিকতায় চিহ্নিত করা যায় না; বরং গবেষকের আর্থ-সামাজিক ও

রাজনৈতিক অবস্থান, তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে একজন ব্যক্তি গবেষক মূর্ত হয়ে ওঠেন। দীর্ঘ সময় ধরে নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে বস্তুনিষ্ঠ রাখার ঐকান্তিক প্রয়াসে তথ্য ও বর্ণনায় গবেষক এবং গবেষিত-গবেষক সম্পর্ক উহ্য থেকে গেছে। অথচ একটি নির্দিষ্ট জ্ঞানকান্ডের শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত সকলকে একই ছকে ফেলা যাবেই কিংবা সকলেই একই ভাবে জ্ঞানকান্ডকে আত্মস্থ করবে এমনটি ভাবা অসঙ্গত। ব্যক্তির জ্ঞানতাত্ত্বিকবোধ, তার বিকাশের সামাজিক, সংস্কৃতিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের পাশাপাশি ব্যক্তির স্বতন্ত্র চেতনা ও মনোজগতে জটিল মিথস্ক্রিয়া প্রতিনিয়ত ক্রিয়াশীল। যা ব্যক্তির গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ, তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ থেকে শুরু করে গবেষণার প্রতিটি পর্যায়কে প্রভাবিত করতে পারে। অথচ একজন নৃবৈজ্ঞানিক গবেষকের যে প্রথাগত ইমেজ তৈরী হয়েছে তাতে গবেষক এক নির্মোহ নৈব্যর্ক্তিক চরিত্র শুধুমাত্র জ্ঞানের তাগিদই তাকে চালিত করে।

গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে স্থানীয় বা গবেষিতদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন, তাদের বিশ্বাস অর্জন, তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা তৈরী এবং একই সাথে নৈর্ব্যক্তিকতা ও চাতুর্যের ব্যবহার-যেন কাঙ্খিত তথ্য যথাযথ ভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

গবেষকের ও গবেষণার এই প্রথাগত চিত্রকল্পগুলো ভীষণ ভাবে নাড়া খেয়েছে যখন থেকে গবেষকেরা তাদের আত্মজীবনী, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা, ডাইরী ইত্যাদিতে তাদের অভিজ্ঞতা ও অভিব্যক্তিকে তুলে ধরতে শুরু করেন। গবেষক ও গবেষিতদের সম্পর্ক, গবেষিতদের আন্তঃসম্পর্ক হতে উদ্ভূত বিভিন্ন বিষয়াদি ও সমস্যা নৃবিজ্ঞানের প্রথাগত ও তাত্ত্বিক ধারাকে ভাবিয়ে তোলে।গবেষকের ল্যাবরেটরী যদি হয় তার মাঠ এবং বিষয় যদি হয় 'ব্যক্তি (বর্গ) যারা নিয়ত পারস্পরিক ক্ষেত্রে গবেষকের সাথে ক্রিয়াশীল এবং সংবেদনশীল; তাদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু বিষয় গুরুত্ব পায়। এ ধরনের বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে গবেষকের কতিপয় সামাজিক দক্ষতা যেমন বোঝাপড়া, ধৈর্য্য, প্রত্যয়ন ক্ষমতা, যেগুলো বিশেষ ভাবে বিকশিত করা প্রয়োজন (Crick 1982 quoted in Ellen 1993)। বলাই বাহুল্য, উপরোক্ত বিষয়গুলো অনেকাংশে গবেষকের ব্যক্তিত্ব ও গবেষনার পরিস্থিতিনির্ভর। আবার গবেষিতদের কাছে গবেষকের ইমেজও গবেষিতদের অবস্থান সাপেক্ষ। একটি ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিসরে আত্মস্থ হতে শেখা নৃবিজ্ঞানীকে গবেষিতদের কাছে অবোধ শিশুও মনে হতে পারে (Kobben 1967, Beals 1970 Quoted in Ellen 1993: 102)। গবেষিত মানুষেরা যেভাবে তাদের নিজ নিজ অর্থবোধকতার সাপেক্ষে গবেষককে চিহ্নিত করে তা প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্তকেও প্রভাবিত করে।

৩.২ আত্মসত্তা ও 'অন্য'

এথানোগ্রাফিক গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক প্রধান যে সমস্যার সম্মুখীন হয়, তা হলো-'ব্যক্তিসত্তা' ও 'অন্য' কে পৃথকীকরণ ও একীভূতকরণের সমস্যা। "অন্য" মানুষদের মাঝে বসবাস করা এবং একই সময়ে বস্তুনিষ্ঠ (Objective) পর্যবেক্ষণকারী হওয়া"' (Middleton 1970, Gans 1986 quoted in Elllen 1994:101) এর মধ্যে দিয়ে গবেষকের প্রত্যয়ন ও চর্চা এই-দুটো বিষয়কে মূলতঃ পৃথক করার চেষ্টা করা হয়। বাস্তবিক ক্ষেত্রে তা অসম্ভব বা অবাস্তব। তথ্য ও উপাত্তগুলো, গবেষকের 'সত্তা' এবং গবেষিতের 'সত্তা' (এই দুই সত্তার একটি অপরটির সাপেক্ষে 'অন্য')র জটিল মিথস্ক্রিয়ার ফসল বলে গবেষক ও গবেষিতের সত্তার সীমারেখা টানা দুরূহ।

গবেষণা পদ্ধতি গবেষকের সত্তাকেও প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করে। দীর্ঘ মাঠ গবেষণার দ্বারা নৃবিজ্ঞানের একজন শিক্ষানবিশের ক্রমশ একজন পূর্ণ নৃবিজ্ঞানী হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে rites de Passage এর সাথে তুলনা করেছেন কেউ কেউ (Epstein: 1967)। আবার গবেষণার মধ্য দিয়ে পি. এইচ. ডি কিংবা অন্য কোন উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের দ্বারা গবেষকের নিজ প্রেক্ষিতে পরিচিতি নির্মিত হয় (Fortier 1996:306)। গবেষকের কর্মজীবনের পরিবর্তন ছাড়াও পরিবর্তন সুচিত হতে পারে তার মতাদর্শগত অবস্থান বা মনোজগতেও। চক্রবর্তী (Chakravati 1979) রাজস্থানে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে অনুভব করেন গবেষিত স্থানে জাতের (Caste) আচরণ বিধি মেনে চলার সুবিধা। এই ধরণের কিছু আচরণ বিধি পালন বা বিভিন্ন আচারে অংশগ্রহণ গবেষককে আপেক্ষিক স্বাধীনতা বা প্রবেশাধিকার দিতে পারে। নিজ সমাজে বা অন্য সমাজে গবেষণার সময় কোন বিশেষ আচরণ বা অনুষ্ঠানে গবেষক সমসময় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ না করলেও এই ছদ্মাবরণের মাত্রা ও ক্ষেত্র গবেষকের আগ্রহ ও স্বার্থ নির্ভর। এই ধরণের ভান ও ভনিতা প্রসূত গবেষকের আত্মপরিচয়ের সংকট এবং মানসিক দ্বন্দ্ব গবেষণা পরিস্থিতি হতে উদ্ভূত হতে পারে। বোহানান (Bohannan 1964) নিজ সমাজ ও গবেষিত সমাজ-উভয়ের সদস্য হবার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যেতে যেতে আবিস্কার করেন যে তিনি ইউরোপিয়দের মাঝে যেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন, তেমনি তার গবেষিত Tiv দের প্রকৃত একজন হয়ে ওঠাও তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

স্থানীয়দের মত জীবন যাপন, ভাষা শেখা, অংশগ্রহণ ইত্যাদির দ্বারা স্থানীয় হয়ে ওঠা আর প্রকৃত স্থানীয় অবস্থানে পার্থক্য থেকেই যায়। গবেষকের স্থানীয় একজন হয়ে ওঠার বিষয়টি কতটা একজন বহিরাগতের প্রতি প্রাথমিক কৌতুহল ত্যাগ

করে তাকে মেনে নেয়া আর কতটা আপন করে নেয়া তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষকের অংশ গ্রহণের মাত্রা ও সীমারেখা গবেষিত কর্তৃক নির্ধারিত হয়। আবার গবেষিতদের ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক জীবন ও অনুভবের পরিধিতে গবেষকের সহজ অনুপ্রবেশ; এবং গবেষকের একই পরিধিতে গবেষিতের প্রবেশে অনধিকার গবেষক ও গবেষিতের সামাজিক ক্ষমতার অসমতাকে নির্দেশ করে। অনুরূপ ভাবে গবেষকের দায়বদ্ধতা ও ভূমিকা তার ব্যক্তিগত নৈতিকতা ও চৈতন্য হতে উৎসারিত।

৪.০ উপসংহার

গবেষণায় আত্মগত (Subjective) প্রভাব একান্ত ভাবেই অনস্বীকার্য। এনলাইটেনমেন্ট যুগে দার্শনিক তত্ত্বগুলোতে মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য যে পদ্ধতির কথা বলা হয় তাতে সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্পর্কে দার্শনিকদের নিলির্প্ততা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অভাব স্পষ্ট। কিছু কিছু আলোচনায় রাজনৈতিক বিষয়াদি থাকলেও তা অনেক অংশে ধর্মীয় বা নৈতিক আলোচনায় পর্যবসিত হয়েছে। নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জ্ঞান চর্চা রাজনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরের বিভিন্ন জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তি ও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কগুরো আবর্তিত হয়। যে কারণে ব্যক্তির উপস্থিতিবর্জিত তথ্য ও উপাত্ত নির্ভর জ্ঞান অর্জন ও আত্মস্থীকরণ অসাধ্য বলা যেতে পারে। বরং জ্ঞান অর্জন প্রক্রিয়া তথা গবেষণায় ব্যক্তির উপস্থিতির প্রেক্ষিত অনুধাবন ও চরিত্র বিশ্লেষণ করে তা থেকে সম্যক উপলব্ধিতে পৌঁছোনোই প্রকৃত প্রজ্ঞাকে নির্দেশ করে। আশার কথা যে সাম্প্রতিককালে নৃবিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যক্তির উপস্থিতি এবং ভূমিকা আলোচিত হচ্ছে। এই মুহূর্তে কোন পরিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানো দুরূহ হলেও এর মাধ্যমে গবেষক ও জ্ঞানকান্ডের রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতাকে এড়িয়ে যাওয়ার অসম্ভব।

তথ্যসূত্র

Abu-Lughod (1991) Writing against Culture in Richard G.Fox (ed). *Recapturing Anthropology: Working in the Present.*

Asad, T (1973)*Anthropology and the Colonial Encounter* London: Ithaca Press.

Barnard, Alan and Spencer, Jonathan, eds (1998) *Encylopedia of Social and cultural Anthropology* London : Runtledge.

Berreman, G.D (1962)*Behind Many Masks: Ethnography and Impression on Management in a Himalayan Village.* Society for Applied Anthoropology, Monograph No: 4.

Boas, Franz (1935) *Kwakiutl Culture as Reflected in Mythology* New York.

Bohannan, L.(1964)*Return to Laughter: An Anthropological Novel*

New York: Harper & Row.

Chakravarti A. (1979) Experiences of an encapsulated observer: A Village in *Rajasthan in The Fieldworker and The Field: Problems and Challenges in Sociolgical Investigation* (eds. Srinivas, M. N., Shah, A. M. and Ramswamy, A) Oxford University Press: Delhi.

Clifford, Jand Marcus, G. E. (1986). *Writting Culture: The poetics and Politics of Ethnography* Berkeley: University California Press.

Epstein, A.1. (1967) *The Craft Social Anthropology* London: Tavistock Publication.

Fortier, Anne-Marie (1996) Troubles in the Field : The use of personal experiences as sources of knowledge in *Critique of Anthropology, Vol.: 16 (3):303-323.*

Hammersley, Marlyn (1990) *The Dilemma of Qualitative Methods; herbert Blummer and the Chicago Tradition* Routledge.

Harding Sandra (1992) Subjectivity, Experience and knowledge: An epistemology from/for Rainbow in *Development and Change* Vol. 23 (No.3).

Hymes. Dell, ed. (1969) *Reinventing Anthropology* Vintage, New York

Kuper, Adam (1988) *The Invention of Primitive Society : Transformation of an Illusion* London : Routledge

Malefijt, anne-Marie de well (1974) *Images of Man: A History of Anthropological thought* Scientific Book agency; Calcutta

Pelto, Pertti J, and Pelto. G.H. (1993) *Anthropological Research : The Structure of Inquiry* Cambridge University Press.

Rabinow, P. (1977) *Refiections on Fieldwork in Morocco* Berkeley: University of California Press.

Salzman, Philip Carl, (1996) Methodology In *Encylopedia of Social and cultural Anthropology,* ed. Barnard, Alan and Spencer, Jonathan, London : Runtledge pp. 364-367.

Usher Robin A Critique of the neglected epistemological assumptions of Educational Research in *Understanding Educational Research* (ed. Scott, David and Usher Robin).